সা ত দি ন

১২ জুন : বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও আইএলও ঘোষিত প্রথম আন্তর্জাতিক শিশুশ্রম প্রতিরোধ দিবস পালিত হয়েছে।

রাজধানীর মতিঝিল এলাকা থেকে সাবেক সংসদ সদস্য ও আওয়ামী লীগ নেতা হাজী সেলিমকে গোয়েন্দা পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে।

রাজধানীর ক্যান্টনমেন্ট এলাকা থেকে ২৩ শীর্ষ সন্ত্রাসীর অন্যতম টিটনকে মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ গ্রেপ্তার করে।

১৩ জুন : যমুনা গ্রুপের মদ ও বিয়ার উৎপাদন এবং বাজারজাত নিষিদ্ধ করেছে সরকার।

সিরাজগঞ্জে ইউপি চেয়ারম্যান আওয়ামী লীগ নেতা খাদেমুল ইসলাম মনিকে একদল সন্ত্রাসী কুপিয়ে হত্যা করেছে।

রাজধানীতে ছাত্রদলের অভ্যন্তরীণ কোন্দলে এক গ্রুপের হামলায় ছাত্রদল নেতা আরিফুর রহমান নিহত এবং রাঙ্গামাটিতে সন্ত্রাসীদের গুলিতে ২ জন পাহাড়ি নিহত হয়েছে।

১৪ জুন : জিয়া আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে দুবাইগামী যাত্রী আসিফ মাহমুদকে প্রায় ৩৪ লাখ টাকার বৈদেশিক মুদ্রাসহ গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

রাজশাহী জেলার বাঘা উপজেলার উদয়নগর সীমান্তে চিনির দখল নিয়ে বিডিআর সিপাহিদের সঙ্গে চোরাচালানিদের সংঘর্ষে কমপক্ষে ১০ ব্যক্তি আহত।

১৫ জুন : প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া তিন মাসব্যাপী জাতীয় বৃক্ষরোপণ আন্দোলন ও পক্ষকালব্যাপী বৃক্ষমেলার উদ্বোধন করেন।

সুপ্রিম কোর্ট আইন বিভাগের জ্যেষ্ঠতম বিচারক বিচারপতি মাইনুর রেজা চৌধুরী বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতি নিযুক্ত হয়েছেন।

১৬ জুন : আওয়ামী লীগের উদ্যোগে সারা দেশে সকাল-সন্ধ্যা হরতাল পালিত হয়েছে।

কথা না রাখার রাজনীতি আবার হরতাল

বিরোধী দলকে প্রতিরোধে জোট সরকার মরিয়া হয়ে উঠেছে। স্বাভাবিক রাজনৈতিক কার্যক্রমে পুলিশ বেপোরোয়া লাঠিচার্জ করছে। বিরোধী দল সংসদে না গিয়ে বেছে নিয়েছে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের হরতালের পথ...

লিখেছেন **জয়ন্ত আচার্য**

হরতালের দিনে আওয়ামী লীগের অফিস ঘেরাও করে রেখেছে দাঙ্গা পুলিশ

আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা নির্বাচনের পূর্বে বলেছিলেন বিরোধী দলে গেলে তিনি হরতাল করবেন না। একই ইস্যুতে দুই নেত্রী ঐকমত্য পোষণ করেছিলেন নির্বাচনের পর্যবেক্ষণে আসা সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট জিমি কার্টারের কাছে। আওয়ামী লীগ এখন বিরোধী দলে। এ কারণে আওয়ামী লীগ প্রতিশ্রুতি ভুলতে বসেছে। হয়তো বেগম খালেদা জিয়া বিরোধী দলে গেলেও এই প্রতিশ্রুতি ভুলে যেতেন। আওয়ামী লীগ বলছে, হরতাল ছাড়া তাদের হাতে বিকল্প কোনো পথ খোলা নেই। কারণ সারা দেশে আওয়ামী লীগ নেতা-কর্মীদের ওপর অমানবিক নির্যাতন চলছে। স্বাভাবিকভাবে রাজপথে জোট সরকার কর্মসূচি পালন করতে দিচ্ছে না। সাধারণ সমাবেশের ওপরও পুলিশ লাঠিচার্জ করেছে। তবে বিরোধী দলের এ যুক্তিটি বেশ অবান্তর। কারণ বিরোধী দল সংসদে তাদের এ দাবিগুলো তুলে ধরতে পারত। বিকল্প কোনো আন্দোলনের ধারা রচনা করতে পারে। জোট সরকার দেশের ক্রম অবনতিশীল রাজনৈতিক পরিস্থিতির কোনো উন্নয়নের চেষ্টা না করে হরতাল প্রতিরোধে বেছে নিয়েছে পুলিশ বাহিনীকে। ১৬ জুনের হরতাল প্রতিরোধে রাজধানীর রাজপথে পাঁচ হাজার পুলিশ ও বিডিআর নিয়োগ করা হয়েছে। হরতাল প্রতিরোধে ব্যবহৃত হচ্ছে সরকার নিয়ন্ত্রিত বাংলাদেশ টেলিভিশন। হরতালের আগে প্রতিদিন টেলিভিশনে বিগত প্রধানমন্ত্রীর হরতাল বিরোধী বক্তব্য রসালোভাবে পরিবেশন করা হচ্ছে। অথচ বিএনপি ভুলে গেছে, '৯১ থেকে '৯৬ সালে তাদের শাসনামলে প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া প্রায় জনসভায় হরতাল পালনকারীদের বিদেশী শত্রু ও দেশের অর্থনীতির ধ্বংসকারী বলে অভিহিত করতেন। তিনিও বিরোধী দলে গিয়ে আওয়ামী সরকারের বিরুদ্ধে ৩০০ দিন হরতাল করেছেন। মূলত ক্ষমতায় গিয়ে মরিয়া হয়ে উঠেছে জোট সরকার। আওয়ামী লীগ সরকারের ব্যর্থতার ইস্যু নিয়ে সংসদে নয়, রাজপথে আন্দোলন করতে যাচ্ছে। এগিয়ে যাচ্ছে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের হরতালের দিকে।

স্বাধীনতা-উত্তর দেশের রাজনীতিতে বিরোধী দলের হরতাল প্রধান হাতিয়ার হয়ে ওঠে। দেশের একত্রিশ বছরের ইতিহাসে হরতাল হয়েছে প্রায় সোয়া তিন বছর। বঙ্গবন্ধু সরকারের বিরুদ্ধে দেশে ২২ দিন হরতাল হয়েছে। জিয়া সরকারের আমলে ৫৯

দিন হরতাল পালিত হয়েছে। স্বৈরাচার এরশাদ সরকারের পতনের জন্য জাতীয় ও আঞ্চলিক পর্যায়ে হরতাল হয়েছে ৩২৮ দিন। খালেদা জিয়া সরকারের বিরুদ্ধে আওয়ামী লীগসহ বিরোধী দল জাতীয় ও আঞ্চলিক পর্যায়ে ৪১৬ দিন হরতাল করেছে। আওয়ামী লীগ সরকারের সময়কালে বিএনপি ও জোট মিলে জাতীয় ও আঞ্চলিক পর্যায়ে ৩০০ দিন হরতাল করেছে। ফলে বিগত প্রতিটি সরকারের কার্যক্রম হরতাল দ্বারা হয়েছে ব্যাহত। থমকে দাঁড়িয়েছে উন্নয়ন কার্যক্রম। একদিন হরতাল করলে শুধু গার্মেন্টস সেক্টরেই ১০০ কোটি টাকার ক্ষতি হয়। বিএনপি ক্ষমতায় আসার পর আওয়ামী লীগ ইতিমধ্যে ৬টি হরতাল পালন করেছে। হরতালের কারণে ক্রম অবনতিশীল অর্থনীতি আরো বিপর্যয়ের মধ্যে পড়তে যাচ্ছে। আওয়ামী নেতা তোফায়েল আহমেদ জনসভায় বলেছেন, নির্যাতন বন্ধ না হলে হরতালই হবে আন্দোলনের একমাত্র পথ।

জোট সরকার নির্বাচনের পূর্বে জনগণকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল ক্ষমতায় গেলে তারা দেশে সুষ্ঠু একটি গণতান্ত্রিক ধারা বজায় রাখবে। নির্বাচনের পূর্বে প্রধানমন্ত্রী প্রতিটি জনসভায় সন্ত্রাসমুক্ত সমাজ গঠনের জন্য তাকে ভোট দেয়ার আহ্বান জানিয়েছিলেন। নির্বাচনের আগের দিন দেয়া রেডিও-টেলিভিশনে জাতির উদ্দেশে দেয়া ভাষণে বলেছিলেন, ক্ষমতায় গেলে প্রতিহিংসার রাজনীতি করবেন না। মেধা ও যোগ্যতা হবে প্রশাসনের পদোন্নতির যোগ্যতা। অথচ ক্ষমতায় আসার পরের দিন থেকে জনগণ দেখলো বিপরীত চিত্র। দখলে মেতে উঠল জোট কর্মীরা। খুন, চাঁদাবাজি, অপহরণ, সন্ত্রাস, ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতন অতীতের রেকর্ড ছাড়ালো। সর্বত্র চললো ছাটাই প্রক্রিয়া। দলীয় আদর্শ হয়ে উঠল প্রশাসনের পদোন্নতি ও গুরুত্বপূর্ণ স্থানে নিয়োগের হাতিয়ার। দেশের সব বিশ্ববিদ্যালয়গুলো থেকে নির্বাচিত উপাচার্যকে ব্রিটিশ আমলের একটি আদেশ বলে সরিয়ে দেয়া হলো। নিয়োগ পেলো দলীয় ও পছন্দের শিক্ষক। বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা থেকে চললো ছাটাইয়ের প্রক্রিয়া। বিরোধী দলের নেতা-কর্মীদের ওপর নির্যাতনের মাত্রা এখন বেড়েই চলছে। একের পর এক তাদের জড়ানো হচ্ছে মিথ্যা মামলায়। বাড়ছে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য। জনগণের সামর্থ্যের কথা বিবেচনা না করেই বাজেটে ধরা হয়েছে অতিরিক্ত কর। দৃশ্যত দেখে মনে হচ্ছে সরকার অতীত থেকে কিছুই শেখেনি। এসব ইস্যু নিয়ে বিরোধী দল আন্দোলনে যাবার প্রস্তুতি নিচ্ছে। হরতালের মতো কর্মসূচি দেয়ার কারণ খুঁজে পাচ্ছে। এ কারণে দেশ পরিচালনায় জোট সরকারকে হতে হবে আরো আন্তরিক। নির্বাচনের পূর্বে জনগণকে দেয়া প্রতিশ্রুতি ভুলে গেলে চলবে না। মনে রাখতে হবে, জনগণই সকল ক্ষমতার উৎস।

বিরোধী দলকে জনগণ ভোট দিয়েছে সংসদে গিয়ে জনগণের কথা বলার জন্য। তারা ৬২টি আসন পেলেও ভোট পেয়েছে শতকরা ৪০ ভাগ। বিরোধী দল গণতান্ত্রিক দেশে ছায়া সরকার। এ কারণে আন্দোলন নয়, প্রথমে তাদের সংসদে গিয়ে কথা বলতে হবে। হরতাল নয়, দেশের অর্থনীতির কথা ভেবে আন্দোলনের বিকল্প ধারা খুঁজে বের করতে হবে। সংসদে ও রাজপথে সরকারকে সঠিকভাবে চলতে বাধ্য করতে হবে। সর্বোপরি মনে রাখতে হবে, জনগণকে দেয়া আওয়ামী লীগ নেত্রী শেখ হাসিনার হরতাল না করার প্রতিশ্রুতি। প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ হলে আগামী নির্বাচনে জনগণের কাছে তাকে জবাবদিহি করতে হবে।

৪ বছর পর রুবেল হত্যা মামলার রায়

চাঞ্চল্যকর শামীম রেজা রুবেল (২৩) হত্যা মামলার রায় হলো প্রায় ৪ বছর পর। রায়ে অভিযুক্ত ১৩ ডিবি পুলিশকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড এবং সহায়তাকারী মুকুলী বেগমকে ১ বছর সশ্রম কারাদণ্ড দেয়া হয়েছে। ১৯৯৮ সালের ২৩ জুলাই বৃহস্পতিবার রুবেলকে তাদের সিদ্ধেশ্বরীর বাড়ি (৬৩/১) থেকে ধরে আনে ডিবি পুলিশের এসআই হায়াতুল ইসলাম ঠাকুর, আব্দুল করিম, হাবিলদার নূরুজ্জামান এবং কনস্টেবল পারভেজ ও মীর ফারুক। এরপর ডিবি অফিসে নিয়ে পেছনে চেয়ারের সঙ্গে হাত বেঁধে গজারি লাকড়ি দিয়ে নির্মমভাবে পেটায়। কয়েক ঘণ্টা মধ্যযুগীয় নির্যাতনে রুবেলের মৃত্যু হয়। রুবেলকে ধরে আনার এবং নির্যাতন করার নির্দেশ দিয়েছিল তৎকালীন এসি ডিবি আকরাম হোসেন। রুবেল হত্যার পর বাদী হয়ে মামলা করেছিলেন তার বাবা আব্দুর রব। তিনি পুত্র শোকে গত বছর মারা গেছেন। দেখে যেতে পারেননি পুত্র হত্যার বিচার। দীর্ঘ তদন্তের পর '৯৯ সালের ১০ মে মামলাটি আদালতে ওঠে। ১৪৯ কার্যদিবসে ৬২ জনের মধ্যে ৩৫ জনের সাক্ষ্য গ্রহণ করে শেষে মহানগর অতিরিক্ত দায়রা জজ মোল্লা মোস্তফা কামাল গত ১৭ জুন এই রায় দেন। মামলার রায় ঘোষণার সময় আসামিদের আদালতে হাজির করা হয়েছিল। রায়ের পরে মাইক্রোবাসে জেলে নিয়ে যাওয়ার সময় প্রধান আসামি এসি আকরাম হাত ঝুলিয়ে উচ্চস্বরে বলেন, বাংলাদেশে বিচার বিভাগ স্বাধীন নয় বলেই আমাকে শাস্তি দেয়া হয়েছে, আমাকে ফাঁসানো হয়েছে। বিচার ব্যবস্থা স্বাধীন হলে আমার কিছুই হতো না। রুবেলের বৃদ্ধ মা জাহানারা বেগম প্রতিক্রিয়ায় বলেন, আদালতের এই রায় আমি মেনে নিতে পারি না। আমার ছেলেকে যারা মেরেছে তাদেরও মৃত্যুদণ্ড হবে এটাই আশা করেছিলাম।

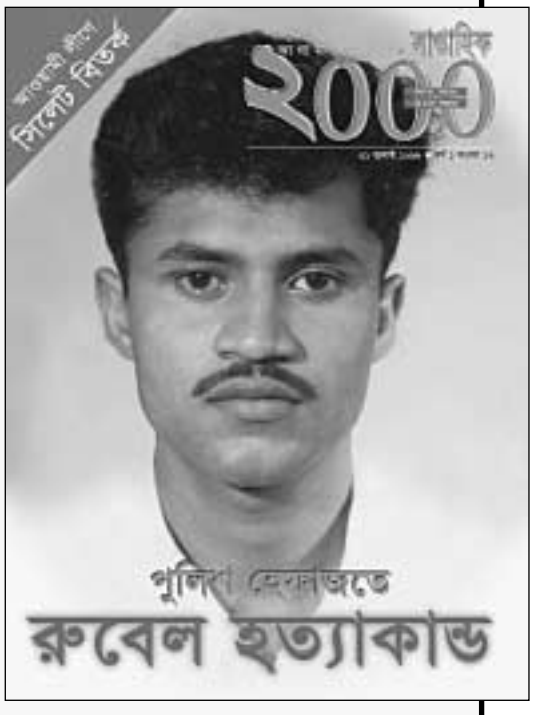

রুবেল হত্যাকান্ড নিয়ে করা সাপ্তাহিক ২০০০-এর প্রচ্ছদ

রুবেল হত্যার প্রধান আসামী এসি আকরাম

সিলেটে জোড়া খুন

সিলেট শহরের শিবগঞ্জ এলাকার দেবপাড়া আবাসিক এলাকার আল্পনা-৫০ নম্বরের সুরম্য দ্বিতল বাসায় বিধবা বৃদ্ধা বীনা দেব রায় মেয়ে ঊষা রাণী দে-কে (৪৮) নিয়ে বসবাস করতেন। বাসার নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা মা-মেয়ের করুণ মৃত্যু ঠেকাতে পারেনি। গত ১১ জুন সন্ধ্যা রাতে নিজ বাসায় এই হতভাগ্য মা-মেয়েকে কে বা কারা ধারালো অস্ত্রের আঘাতে অত্যন্ত ঠাণ্ডা মাথায় খুন করে পালিয়েছে। রহস্যজনক এই জোড়া খুনের ঘটনা গোটা শহর জুড়ে মানুষের মুখে মুখে আলোচিত হচ্ছে। পুলিশ এই হত্যাকাণ্ডের মোটিভ উদ্ধার এবং এই জোড়া খুনের সঙ্গে জড়িত কাউকে গ্রেপ্তার করতে না পারলেও ধারণা করা হচ্ছে, বীনা দেব রায়ের কয়েক কোটি টাকার সম্পদ আত্মসাতের জন্য এই জোড়া খুনের ঘটনা ঘটানো হয়েছে। আর এই হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে নিহতের পরিবারের ঘনিষ্ঠ কেউ না কেউ জড়িত বলেও ধারণা করা হচ্ছে।

জানা গেছে, দেবপাড়া আল্পনা-৫০ নম্বর বাসার বাসিন্দা মৃত কালী প্রসন্ন দেব রায়ের মৃত্যুর পর বিধবা বীনা দেব রায় দোতলা বাসার এক ইউনিটে মেয়ে ঊষা রাণী দেকে নিয়ে বসবাস করে আসছেন। অবশ্য ঊষা রাণী বিবাহিত। তার স্বামী সুনামগঞ্জ সরকারি ডিগ্রি কলেজের হিসাববিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক প্রশান্ত শেখর দে। প্রীতম শেখর দে নামে তাদের একটি পুত্রসন্তান রয়েছে। সে এবারে এইচএসসি পরীক্ষা দিচ্ছে। তবে স্বামীর সঙ্গে মনোমালিন্য থাকায় ঊষা রাণী গত ১০ বছর ধরে মায়ের সঙ্গে দেবপাড়ার বাসায় বসবাস করে আসছেন। স্বামী-স্ত্রীর কোনো সম্পর্ক না থাকলেও তাদের মধ্যে বিচ্ছেদ হয়নি বলে জানা গেছে।

এদিকে মা-মেয়ে ছাড়া ওই দোতলা বাসার অন্য ইউনিটে এবং দোতলায় ভাড়াটিয়া হিসেবে রয়েছে একজন ব্যবসায়ী ও অন্য একটি পরিবার। ঘটনার রাতে ১১ জুন ভাড়াটিয়া ব্যবসায়ীর স্ত্রী ইতি দেব তার বাবার বাড়িতে পূজাআর্চনায় যান। এ সময় বীনা দেব গ্রিলে তালা দেন। রাত ৯টায় তিনি বাসায় ফিরে প্রসাদ বিতরণের সময় গৃহকর্ত্রীকে ডাকাডাকি করে কোনো সাড়াশব্দ না পেয়ে গৃহকর্ত্রী ঘুমিয়ে পড়েছেন ধারণা করে তিনি ঘরে ফিরে যান। বাসা থেকে পূজায় যাবার সময় গৃহকর্ত্রী গ্রিলে তালা দিলেও বাসায় ফিরে ইতি দেব দেখতে পান গ্রিলের তালা খোলা। আর ওপর তলার ভাড়াটিয়া ব্যাংকার বনানী দাস জানিয়েছেন, ঘটনার রাত ৮টা থেকে সাড়ে ৮টার মধ্যে নিচতলায় নিহত বীনা দেব রায়ের মেয়ে ঊষা রাণীর উচ্চস্বরে হাসির শব্দ শুনতে পেয়েছেন। এর পরপরই সবকিছু নীরব হয়ে যায়। এসব কিছু থেকে ধারণা করা হচ্ছে, ১১ জুন রাত ৮টা থেকে ৯টার মধ্যে ওই জোড়া খুনের ঘটনা ঘটেছে। আর হত্যাকাণ্ডের সময় ওই পরিবারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ এমন কেউ সেই বাসায় উপস্থিত ছিলেন।

হত্যাকাণ্ডটি অত্যন্ত ঠাণ্ডা মাথায় ও পরিকল্পিতভাবে সম্পন্ন করা হয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। কারণ খুনিরা হত্যাকান্ডের পর চলে যাওয়ার সময় বাসার ভেতর থেকে দরজার লক লাগিয়ে যায়। যাতে আশপাশের লোকজন সহজেই ধারণা করতে পারেন যে, মা-মেয়ে ঘুমিয়ে আছে। এদিকে নৃশংস ওই জোড়া খুনের ঘটনার পর ঊষা রাণী দে'র ছেলে প্রীতম শেখর দে বাদী হয়ে একটি মামলা দায়ের করেছে। মামলাটি তদন্তের জন্য ১২ জুন গোয়েন্দা বিভাগে হস্তান্তর করা হয়েছে। পুলিশ তদন্ত চালিয়ে যাচ্ছে। এখন পর্যন্ত হত্যাকাণ্ডের কারণ রহস্যাবৃত। তবে গোয়েন্দা পুলিশ ইতিমধ্যে নিহতের বাড়ি থেকে স্বর্ণালঙ্কার, নগদ অর্থ ও সঞ্চয়পত্রসহ প্রায় ৩০ লাখ টাকার মালামাল উদ্ধার করেছে। কিন্তু নিহত বীনা দেব রায়ের সম্পত্তির কোনো কাগজপত্র তার বাসায় পায়নি পুলিশ। আর এ নিয়ে সঙ্গত কারণে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে নিহতের জায়গা-জমির দলিল গেল কোথায়?

এ ব্যাপারে মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা গোয়েন্দা পুলিশের এসআই শামসুদ্দীন আহমদের সঙ্গে যোগাযোগ করলে তিনি সাপ্তাহিক ২০০০কে বলেন, তারা এখন পর্যন্ত (১৫ জুন) হত্যা রহস্যের কোনো কূল-কিনারা করতে পারেননি। তবে তিনি ৯০ ভাগ নিশ্চিত, এই জোড়া খুনের পেছনে সম্পত্তি তসরুপের বিষয়টি জোরালোভাবে কাজ করেছে। তিনি আরো জানান, ঘটনার রাতে ওই বাসায় আসা এক ব্যক্তিকে পুলিশ খুঁজছে, যে কলিংবেল টিপে বাসায় প্রবেশ করেছিল। তবে কবে নাগাদ এই জোড়া খুনের রহস্যের কূল-কিনারা করতে পারবে গোয়েন্দা পুলিশ তা নিশ্চিত করে বলতে পারেননি মামলার আইও। হত্যাকান্ড সম্পর্কিত এক প্রশ্নের জবাবে এসআই শামসুদ্দিন ২০০০কে বলেছেন, হত্যাকাণ্ডের ধরন দেখে মনে হচ্ছে পেশাদার খুনিদের দিয়ে এই জোড়া খুনের ঘটনা ঘটানো হয়েছে।

প্রসঙ্গত, ১১ জুনের জোড়া খুনের ঘটনা নিয়ে সিলেট শহরে গত ১৬ মাসে তিনটি জোড়া খুনের ঘটনা ঘটল। এর মধ্যে একটির চার্জশিট শিগগিরই জমা দেবে গোয়েন্দা পুলিশ। আর অন্যটির কোনো কূল-কিনারা করতে পারেনি পুলিশ।

নিজামুল হক বিপুল

ছাত্রলীগ নেতাদের মুক্তি দাবি

কারাবন্দি ছাত্রলীগ কেন্দ্রীয় নেতাদের মুক্তির দাবি জানিয়েছেন নিকটাত্মীয়রা। গত ১৪ জুন রিপোর্টার্স ইউনিটি মিলনায়তনে সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে তারা এ দাবি জানান। সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন আটক ছাত্রলীগ কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি লিয়াকত শিকদারের মা সুফিয়া শিকদার। নিকটাত্মীয়দের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন লিয়াকত শিকদারের ভাই মিরাদুল সিকদার, সাধারণ সম্পাদক নজরুল ইসলাম বাবুর ভাই জহিরুল ইসলাম, বোন দেলোয়ারা বেগম সহ-সভাপতি রফিকুল ইসলাম কোতোয়ালের ভাই হাসিমুল ইসলাম কোতোয়াল মিঠু, ভগ্নিপতি আব্দুস সোবহান। লিখিত বক্তব্যে লিয়াকত শিকদারের মা সুফিয়া বেগম বলেন, আমার ছেলে কি যুদ্ধবন্দি। তবে তাকে স্বাভাবিক খাবার-দাবার তো দূরের কথা, বিশুদ্ধ পানিটুকুও দেয়া হচ্ছে না। তিনি বলেন, গ্রেপ্তারের আগে আমার ছেলে এবং তার ছাত্রলীগ সহকর্মী কারও নামেই থানায় কোনো মামলা ছিল না। অথচ বিরোধীদলীয় নেত্রীর বাসা থেকে ফেরার পথে ৪ মাস আগে ৫৪ ধারায় পুলিশ তাদের আটক

কারাবন্দি ছাত্রলীগ সভাপতি লিয়াকত শিকদার

করে। ৫৪ ধারায় আটক করার পর তাদেরকে বিশেষ ক্ষমতা আইনে আটকাদেশ দেয়া হয়। এটুকু করেও সরকার থামেনি। সর্বশেষ চারটি হত্যা মামলায় সরকার তাদের আটক দেখিয়েছে। কারাবন্দি ছাত্রলীগ সাধারণ সম্পাদক নজরুল ইসলাম বাবুর ভাই জহুরুল ইসলাম বলেন, আমাদের আত্মীয়-পরিজন গ্রেপ্তারকৃত ছাত্রলীগ নেতাদের সঙ্গে দেখা করতে পারছে না। অসুস্থ ছাত্রলীগ নেতা লিয়াকত শিকদারকে দেখতে গিয়ে আওয়ামী লীগ নেতারা গাজীপুর কারাগার থেকে ফিরে এসেছে। তাদের ক্ষেত্রে জেল কোডের নিয়ম মানা হচ্ছে না। সংবাদ সম্মেলনে অবিলম্বে কারাবন্দি ছাত্রলীগ নেতাদের মুক্তির দাবি জানানো হয়। তাদের জড়ানো মিথ্যা মামলা তুলে নেওয়ার আহ্বান করা হয়। এ সময় উপস্থিত ছিলেন ছাত্রলীগ কেন্দ্রীয় কমিটির সহ-সভাপতি বলরাম পোদ্দার, শাহাজাদা মহিউদ্দীন, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক খান মঈনুল ইসলাম মোস্তাক, সাংগঠনিক সম্পাদক খলিলুর রহমান, সাবেক আইন বিষয়ক সম্পাদক প্রশান্ত ভূষণ বড়ুয়া।